গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৫ - ১১ এপ্রিল ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

সন্ত্রাসবাদী বুঝেও অসীমানন্দকে শাস্তি দিতে পারলেন না বিচারপতি

সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ

দিল্লি থেকে লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৬৮ জন নিরীহ যাত্রীকে মেরেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি)-র প্রত্যক্ষ সহায়তায় আদালতে পুরোপুরি ছাড় পেয়ে গেল সেই সন্ত্রাসবাদীরা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্দেশ ছাড়া যে তারা এমন বেকসুর হতে পারত না তা যে কোনও মানুষই বুঝছেন। এমনকী এনআইএ-র বিশেষ আদালতের বিচারক জগদীপ সিং পর্যন্ত অনুভব করেছেন, সন্ত্রাসবাদীরা ৬৮ জন মানুষকে হত্যা করল, অথচ তার সঠিক তদন্ত এবং খুনিদের বিচারের প্রতি কোনও আগ্রহই দেখাল না এনআইএ এবং সরকারি উকিল। সরকারের যোগসাজস আরও বোঝা গেল যখন বিচারকের পূর্ণাঙ্গ রায় জনসমক্ষে আসার আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, সরকার উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনও অ্যাপিল করবে না। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার নামে বিজেপি সরকারের এত ঢাক পেটানো যে কেবল মাত্র ভোটে বাজার গরমের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ঘটনা তা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

২০০৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে সমঝোতা এক্সপ্রেসে সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো বিস্ফোরণে ৪৩ জন পাকিস্তানি নাগরিক সহ ৬৮ জনের মৃত্যু ঘটে। আরও দুই বাক্স বোঝাই না ফাটা বোমা উদ্ধার হয়। অভিযোগ ওঠে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ, মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও, রাজস্থানের আজমির শরিফের মতোই এই বিস্ফোরণের পিছনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী 'অভিনব ভারত' সহ আরএসএস-বিজেপি ঘনিষ্ঠ কিছু সংগঠনই ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনাগুলির মতোই সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণে সুনীল কুমার জোশী এবং নব কুমার সরকার ওরফে স্বামী অসীমানন্দের নামই প্রধান চক্রী হিসাবে উঠে আসে। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকারও যেমন হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারাবার আশঙ্কায় এই হামলায় হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার কোনও আন্তরিক চেষ্টা করেনি, একইভাবে বিজেপি ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে এসে এনআইএ-র উপর প্রভাব খাটিয়ে এই মামলাকে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করে গেছে।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারক আক্ষেপ করে বলেছেন, দিল্লি স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শুরু করে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এনআইএ হেফাজতে নিলেও তা কখনওই আদালতের কাছে 'অন রেকর্ড' প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেনি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ২৯৯ জন সাক্ষীর নাম থাকলেও আদালতে হাজির করা হয়েছিল ২২৪ জনকে। তাদের মধ্যে ৫১ জন বারবার বয়ান বদলাতে থাকে, এনআইএ-র হয়ে সরকারি উকিল তাদের জেরা এবং প্রশ্নোত্তরের সামনে ফেলে সত্যটা বার করে আনার চেষ্টাই করেননি। এনআইএ-র গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ডাঃ রাম প্রতাপ সিং বলেছিলেন, তিনি নিজের কানে শুনেছেন যে, স্বামী অসীমানন্দ ভোপালের একটি সভায় ঘোষণা করেছিলেন, জিহাদিদের পথেই হিন্দুদেরও পাল্টা আক্রমণে যেতে হবে। বলেছিলেন, 'বম্ব কা বদলা বম্ব'। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, এমন একজন সাক্ষীকে সরকারপক্ষ কাজেই লাগায়নি, তাঁকে আদালতে দাঁড়িয়ে জেরা করে তাঁর বয়ানকে সঠিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে আদালতগ্রাহ্য করার চেষ্টাই করেনি। যে সুটকেস দু'টিতে না ফাটা বোমাগুলি ছিল এবং যে সুটকেসগুলির বোমা ফেটেছিল তার টুকরোগুলি মিলিয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন এগুলি একই হাতে তৈরি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচনী প্রচারে জয়নগরের প্রার্থী কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

'চৌকিদার' কিংবা 'জনতা কি সিপাহি', মানুষের চোখে দু'জনেই প্রতারক

পাঁচ বছর পার করে নরেন্দ্র মোদি আবার ভোট চাইতে নানা সাজে অবতীর্ণ। 'আচ্ছে দিন', 'বিকাশ', চাষির আয় দ্বিগুণ করে দেওয়া, বছরে দু'কোটি চাকরি, কালো টাকা উদ্ধার, 'না খাউঙ্গা-না খানে দুঙ্গা'— এ সব কোনও কিছুই এখন তাঁর গলায় আর শুনতে পাওয়ার জো নেই। এখন তিনি রাজস্থান-গুজরাটের পোস্টারে শোভিত হচ্ছেন গলায় বুলেটের মালা ঝোলানো, বন্দুকধারী এক নতুন অবতার রূপে। এখন তাঁর ভরসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা উগ্র-দেশপ্রেমের জিগির আর তীব্র সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ভিত্তিতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার বাতাবরণে সৃষ্ট ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। তাই পাঁচ বছর নানা প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়ানো বিজেপি সরকারের রাজত্বের পর 'এডেলম্যানস ট্রাস্ট ব্যারোমিটার' নামক সমীক্ষা দেখাচ্ছে ভারতের ৭২ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ কোনও ভাল মাইনের কাজের আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। দেশের অধিকাংশ মানুষ একটু সুখে থাকার আশা আর করেন না। ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ সরকার, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকী এনজিওগুলিকেও এতটুকু বিশ্বাস করতে পারছেন না। স্বঘোষিত চৌকিদার প্রধানমন্ত্রী কিংবা আর এক স্বঘোষিত 'জনতা কি সিপাহি' কংগ্রেস সভাপতি ইত্যাদি কোনও ভোটবাজ দলের নেতাকেই অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন না। তাদের প্রতারক মনে করেন তাঁরা।

এর জন্য দায়ী কে? স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি হবে আর তিন বছর পরে। এর মধ্যে দেশ চালিয়েছে হয় কংগ্রেস, না হলে বিজেপি অথবা এই দুই দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনপুষ্ট নানা রঙের দল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নাকি সব কালোবাজারিকে ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি প্রায় দিয়েই দিচ্ছিল! তারপর ইন্দিরা গান্ধীর আমলে গরিবি হটিয়ে দেশকে কেমন সোনায় মুড়ে দিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতাও মানুষের আছে। তারপর বিজেপির নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ি ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ফিল গুড'— খেতে যদি নাও পান, আনন্দ অনুভব করুন। কিন্তু দেশের মানুষ এমনই 'অকৃতজ্ঞ' যে এতবড় উপদেশটাকে না মেনে পেঁয়াজের দাম কেন ১০০ টাকা ছাড়াল, সরষের তেলের দাম কেন আকাশ ছোঁয়া, মানুষের চাকরি কেন নেই, এই সব নিয়ে বিক্ষোভে নেমে পড়ল! এখন নরেন্দ্র মোদি এসে তো এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে, সব সমস্যা একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি! কেমন সে হাল? সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্টই তার পর্দা একেবারে ফাঁস করে দিয়েছে।

মোদি সাহেবের 'আচ্ছে দিনে' ভারতের ৭৩ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে। অন্যদিকে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৩ নম্বরে। কিছুদিন আগে সরকারি সমীক্ষা দেখিয়েছিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ডে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রচার

গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড মুকেশ সেমওয়াল-এর সমর্থনে শ্রীনগর শহরে চলছে পথনাটকের মধ্য দিয়ে প্রচার

মানুষের চোখে দু'জনেই প্রতারক

একের পাতার পর

জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এ দেশের সদ্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বীকার করেছেন, ১২৩ কোটি ভারতীয়ের ৬৬ কোটিই কর্মহীন। ঠিক এর বিপরীত চিত্র হল, ভারতীয় ধনকুবেরদের শীর্ষে থাকা মুকেশ আম্বানির ২০১৮ সালে আয় ছিল দিনে ৩০০ কোটি টাকা। ভারতের ১১৯ জন বিত্তবান মানুষের সম্পদ আচ্ছে দিনের সুবাদে বেড়েছে বছরে ৩৯ শতাংশ হারে, আর একই ভারতে নিম্নতম আয়ের ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের রোজগার বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। আর্থিক বৈষম্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে খরচ, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা এবং মানুষের ন্যূনতম আয় বজায় রাখার নিরিখে বিশ্বের শেষ ১১ দেশের মধ্যে স্থান নিয়েছে 'আচ্ছে দিন'-এর ভারত।

নরেন্দ্র মোদি সরকারে বসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বছরে ২ কোটি চাকরি দেবেন। কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের হাতে থাকা সংবাদমাধ্যমের প্রচারের জোরে দেশের মানুষ তো তাঁকে বিশ্বাসই করেছিলেন! অথচ তাঁরা দেখছেন নতুন চাকরি দূরের কথা, গত এক বছরে কর্মরত মানুষের সংখ্যা কমেছে। এক বছরে কাজ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন ৪ কোটি ৭০ লক্ষ (ডেকান হেরাল্ড ২২ মার্চ, ২০১৯)। নরেন্দ্র মোদি নিজে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে খোলা নতুন অ্যাকাউন্ট প্রমাণ করছে ২ কোটি চাকরি হয়েছে। তাঁর ধামাধরা পারিষদ তথা মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা আবার প্রভুকে খুশি করতে বলে দিয়েছেন, বিজেপি জমানায় ৬ কোটি নতুন চাকরি হয়েছে। এটা যে একেবারে ডাহা মিথ্যা তা দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসএসও)-র সমীক্ষা। এই সমীক্ষা দেখিয়েছে দেশে বেকারির হার বিগত ৪৫ বছরে সর্বাধিক। এনএসএসও বেকারত্বের হার জনসংখ্যার ৬.১ শতাংশ বলায় মোদি সরকার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে দেয়নি। অথচ সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই) সমীক্ষায় বলেছে, এই বেকারত্বের হার আরও বেশি, জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ। সংখ্যার দিক থেকে যা হয় ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ। কিন্তু এই পরিসংখ্যানও দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

কেন্দ্রীয় লেবার বুরো প্রতি বছর শ্রম ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়ে 'এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট-সিনারিও' নামে রিপোর্ট তৈরি করে। ২০১৭-১৮ সালে সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করতে দেয়নি। কারণ ২০১৫ সালে লেবার বুরো দেখিয়েছিল ভারতে কাজের বাজারে আসে জনসংখ্যার মাত্র ৬১ শতাংশ বা প্রায় ৮০ কোটি মানুষ। অর্থাৎ দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ কোটি কাজ পাওয়ার আশাই করেন না। এঁদের মধ্যে বিরাট সংখ্যায় মহিলা যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে পরিবারের গৃহস্থালী বা চাষে এবং অন্যত্রও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। প্রথমোক্ত ৮০

কেন্দ্রীয় লেবার বুরো প্রতি বছর শ্রম ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়ে 'এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট-সিনারিও' নামে রিপোর্ট তৈরি করে। ২০১৭-১৮ সালে সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করতে দেয়নি। কারণ ২০১৫ সালে লেবার বুরো দেখিয়েছিল ভারতে কাজের বাজারে আসে জনসংখ্যার মাত্র ৬১ শতাংশ বা প্রায় ৮০ কোটি মানুষ। অর্থাৎ দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ কোটি কাজ পাওয়ার আশাই করেন না।

কোটির মধ্যে ৩৯ শতাংশই স্বনিযুক্ত। অর্থাৎ পকোড়া ভাজা থেকে শুরু করে ছোটখাটো দোকান, হকারি, মাথায় করে জিনিস ফেরি ইত্যাদি করে টিকে থাকেন। এদের বেশিরভাগই বলার মতো কোনও রোজগার করেন না। সরকার এই সংখ্যাকে যতই কর্মসংস্থান বলুক, কোনও সুস্থ মানুষ এটাকে কাজ বলে মানতে পারেন না। ৩৬.৬ শতাংশ মাঝে মাঝে কাজ পান, ১৯ শতাংশ মজুরির ভিত্তিতে কিছুটা নিয়মিত কাজ করেন, বাকি ৫.৪ শতাংশ একেবারেই কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী। শ্রম মন্ত্রকের ২০১৫-১৬'র রিপোর্ট বলছে, দেশের ৭৭ শতাংশ পরিবারের নিয়মিত রোজগারের মতো কাজ নেই। তাহলে, সরকারি হিসাবেই দেশের কর্মক্ষম মানুষের বেশিরভাগটাই বাস্তবে জীবন নির্বাহ করার মতো কাজ পান না। এর পরেও মানুষ বিজেপিকে বিশ্বাস করবে, প্রতারক বলবে না? কংগ্রেসের রাজত্ব সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা আছে। তখনকার তীব্র বেকার সমস্যার জ্বালা দেশের জনগণ ভুলতে পারে না। সেই কংগ্রেস যখন বছরে ৭২ হাজার টাকার টোপ দিয়ে ভোট চায়— তাকেও কেন প্রতারক বলবে না দেশের মানুষ?

ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়ে রঙ বে-রঙের নেতারা যতই প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটান না কেন, তা বিশ্বাস করলে যে ঠকতে হয় তা বারবার দেখেছে দেশের মানুষ। বিজেপি সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বহর মানুষ সদ্য দেখছে, ফলে তাদের ঠগবাজ চরিত্র জনমানসে জ্বলজ্বল করছে। সেই সুযোগে এখন কংগ্রেস সাধু সাজার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলও এই প্রতিযোগিতায় নেমে মুখে মুখে লক্ষ লক্ষ চাকরির গল্প বলে যাচ্ছে। অথচ এ রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা, কাজ মানে মুখ্যমন্ত্রীর চপ ভাজার উপদেশ, ২ হাজার টাকার ইন্টার্ন শিক্ষক, না হলে অস্থায়ী সিভিক পুলিশ— এর বেশি কোনও কাজের দিশা রাজ্যের যুবকদের দেখায়নি তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে সরকারি স্থায়ী কাজে নিয়োগ প্রায় বন্ধ, যেমন বন্ধ অসংখ্য শিল্প-কলকারখানা। মানুষের অভিজ্ঞতা হল বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএমও অতীতে ক্ষমতায় থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মিথ্যা শিল্পায়নের খোয়াব দেখাতে চেয়েছে। বেকার সমস্যার প্রকৃত সমধানের রাস্তা তুলে না ধরে মানুষকে বুঝিয়েছে, 'সিপিএমকে ভোট দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আবার একটা ভোটের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষকে তাই বুঝতে হবে, বারবার এই দলগুলি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে। এরা প্রত্যেকেই একই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির ছোট-বড় রাজনৈতিক ম্যানেজার। সেই ভূমিকা পালন করতেই এরা ভোট মঞ্চে নানা রঙের কুশীলব হিসাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছে। ভোটের ডামাডোলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুঝতে হবে, এই ভোটবাজ দলগুলি শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। এরা কেউ সাধারণ মানুষের পক্ষে নয়, শোষকের পক্ষে। এই অবস্থায় সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায় করা ছাড়া জনসাধারণের সামনে বিকল্প কোনও পথ নেই। দেশের নানা প্রান্তে সেই আন্দোলন স্ফুলিঙ্গ রূপে ফেটেও পড়ছে। প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক পথের দিশা। নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সেই পথের দিশাকেই তুলে ধরছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

'আখের দাম চাই' দাবি মুজফ্ফরনগরে
হিন্দু-মুসলিম চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করেছে

ছ'বছর আগে উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে মুসলিম এবং হিন্দু জাঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়ে ভোটে জিতেছিল বিজেপি। দাঙ্গার সে ক্ষত পুরোপুরি শুকায়নি। এখনও সে অঞ্চলের মানুষ আতঙ্কে ঘুমোতে পারে না। এই বুঝি জ্বলে উঠল বাড়ি— দুঃস্বপ্নে ভেঙে যায় ঘুম। মানুষকে সন্ত্রস্ত করে সেবার বিজেপি ভোটে জিতলেও এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের চাষিরা ঐক্যবদ্ধ।

কীসের ভিত্তিতে? চিনিকল মালিকদের লাগাতার শোষণ-বঞ্চনা দুই সম্প্রদায়ের আখ চাষিদের মিলিয়ে দিয়েছে। এক কৃষক নেতার কথায়, "গত বছর প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল হিসাবে আমাদের জেলা থেকে ২৬ কোটি টাকার আখ যেত চিনি কলগুলিতে। তার বিনিময়ে মাসে এক কোটি টাকাও আমরা পেতাম না। দিনের পর দিন বকেয়া রয়েছে টাকা। বারবার কাকুতি-মিনতি করেও কোনও ফল হয়নি"। ক্ষুব্ধ কৃষকদের বক্তব্য, মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে দিল্লিতে রয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি একবারও আসার সময় পাননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটের জন্য উত্তরপ্রদেশে এলেও আখচাষিদের এই সমস্যা নিয়ে একটি কথাও বলেননি। কারণ চিনিকল মালিকরা বিজেপিকে মোটা টাকার ফান্ড জোগায়। তাই আখচাষিদের যত সর্বনাশই তারা করুক বিজেপি চটাতে চায় না তাদের।

এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলিম উভয় অংশের চাষিরা অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, আখের ন্যায্য দাম পেতে হলে, কোটি কোটি টাকার বকেয়া আদায় করতে হলে আন্দোলন ছাড়া পথ নেই। আর সেই আন্দোলনের জন্য চাই ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব চাষির ঐক্য। যাঁরা বলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অসম্ভব— এই ঘটনা তাদের দেখাবে যে এই ঐক্য সম্ভব। ছ'বছর আগে মুজফফরনগরে যে গ্রামবাসীরা একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, সেই মুসলিম ও জাঠেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে বন্ধু করে দিয়েছে চিনিকল মালিকদের বেপরোয়া শোষণ।

জীবনাবসান

দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড সুনন্দা দাশগুপ্ত গত ১৯ মার্চ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘদিন হাঁপানি ও সিওপিডি আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রায় গৃহবন্দি ছিলেন।

কমরেড সুনন্দা দাশগুপ্ত ১৯৫৭ সালে সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে পড়ার সময় যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রী, ডিএসও সংগঠক কমরেড সাধনা চৌধুরীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯৫৮ সালে কমরেড সাধনা চৌধুরী সংগঠনের প্রয়োজনেই সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে চলে আসেন। তাঁরই মাধ্যমে কমরেড সুনন্দা দাশগুপ্ত বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং কলেজে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন। সেই বছরই কলেজে ডি এস ও ইউনিট গড়ে তুলে ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৫৮ সালে কমরেড সাধনা চৌধুরী সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালের ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে কমরেড সুনন্দা দাশগুপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ছাত্র বয়সেই তিনি ছিলেন নিঃসংকোচ, অকপট, মিশুকে, সাবলীল এবং খেলাধূলায় পারদর্শী। ১৯৬১ সালে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ফুড সাপ্লাই বিভাগে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। কমরেড দাশগুপ্ত সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নিঃসংকোচ মেলামেশা সরকারি কর্মচারীদের কাছে আপনজন হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সিপিএম পরিচালিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের সাথে তীব্র বিরোধ হলেও কর্মচারীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। তাঁর আবেগ প্রবণতা এবং যুক্তিবাদী মন ও প্রতিবাদী চরিত্র কর্মচারীদের আকৃষ্ট করত। তিনি এফ সি আইতে ডেপুটেশনে কর্মরত কর্মচারীদের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিলেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের সংকীর্ণতা ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের চাপে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ডেপুটেশনে কর্মরত সকল কর্মচারীকে স্থায়ীপদে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। কমরেড দাশগুপ্ত দলের যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এম এস এস, সর্বোপরি শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও গরিব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন দলের প্রতি একনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। ২৫ মার্চ মহাবোধি সোসাইটি হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরী।

কমরেড সুনন্দা দাশগুপ্ত লাল সেলাম

মিডিয়াকে মোদি জমানার ফরমান বিরুদ্ধে বললেই সরতে হবে

ধামাধরা গণমাধ্যম ঃ ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় সমস্ত গণমাধ্যম, বিশেষত টিভি চ্যানেল, দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলি শাসকদলের মুখপত্রে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি চ্যানেল তো প্রায় দলীয় চ্যানেলের মতো লাগাতার এবং সর্বক্ষণ বিজেপির পক্ষে প্রচার চালিয়ে গণমনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'টক-শো'গুলিতে বিজেপির ধামাধরা লোকেদের বসিয়ে তাদের সমস্ত দলীয় এজেন্ডাকে সামনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। এবং কখনও সাম্প্রদায়িকতা, কখনও গো-রক্ষা, অনুপ্রবেশ, কাশ্মীর সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির অজুহাতে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

প্রায় কোনও চ্যানেলই দেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, বেকারত্ব, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, আদিবাসী-দলিতদের উপর আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছে না। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, গরিব কৃষকদের আত্মহত্যা, নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন, নতুন কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারা ইত্যাদি আলোচনায় আনাই হচ্ছে না। ক্ষমতায় আসার আগে বর্তমান শাসকদল যে গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, সেগুলির কণামাত্র পূরণ করতে তারা কেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল, সে-সব নিয়ে কোনও আলোচনা কোনও চ্যানেলে নেই। কোনও চ্যানেল এই প্রশ্ন তুলছে না যে, কেন প্রায় ২৪ লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগ হচ্ছে না, কেন রেলে প্রায় ৪ লক্ষ পদ খালি পড়ে রয়েছে। বাস্তবে, দেশে এখন ৭.২ শতাংশ হারে বেকারত্ব বাড়ছে, যা গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। অথচ চ্যানেলগুলিতে এ নিয়ে বিতর্ক আয়োজন করা হচ্ছে না। বরং সেখানে তারা শাসকদলের পক্ষ নিয়ে নানা অবান্তর বিষয়, যার সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, সেগুলি জনগণকে গেলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এর একমাত্র কারণ, বেশির ভাগ টিভি চ্যানেল চলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির টাকায়। শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে নয়, বরং নিজেদের মুনাফার স্বার্থেও এহেন কাজ করছে ওই সংস্থাগুলি। কয়েকটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য, ব্যাঙ্কে সঞ্চিত জনসাধারণের টাকা লুঠ করার জন্যও শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। আবার, এগুলি যাতে তারা অবাধে করতে পারে সে-জন্য ভোটের সময় এরাই বিজেপির মতো দলগুলিকে বিপুল অর্থ জোগায়। যা দেয়, পাঁচ বছরে তার কয়েকশো গুণ লুটে নেয় জনগণের ঘাড় ভেঙে। মালিকশ্রেণিকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য বিজেপি নতুন কৌশল করে 'নির্বাচনী বন্ড' ছাড়ে বাজারে। এর ফলে কারা কত পরিমাণ টাকা এই দলগুলিকে দিচ্ছে, তা সহজেই গোপন করা যায়। গত নির্বাচনে বিজেপি ৯৫ শতাংশ বন্ড পেয়েছিল। জনগণের দ্বারা ধিক্কৃত কংগ্রেসের বদলে কর্পোরেট সংস্থাগুলি নিজেদের কায়েমি স্বার্থেই বিজেপিকে তুলে ধরেছিল। তাই এদের পরিচালিত মিডিয়ায় সারাক্ষণ বিজেপিকে নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন, বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে বিজেপিকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করা হবে। বিজেপিও বিভিন্ন চ্যানেলকে টাকা দেয়। এইসব চ্যানেলের কাজ হল, কোনও ঘটনাকে একপেশে করে দেখানো। সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে যা সামনে আনতে চায়, যা আড়াল করতে চায়, সে-সবই পরিকল্পনা মতো চ্যানেলে চলে। জনগণের সমস্যা যতটুকু তারা তুলে ধরে তা নিতান্ত বাধ্য হয়ে, গণবিক্ষোভের চাপে পড়ে। অনেকটা সিটির মাধ্যমে প্রেসার কুকারের হাওয়া বের করে দেওয়ার মতো। কেন না, মাঝে মধ্যে এমন না করলে ক্ষোভ ফেটে পড়ে অনর্থ ঘটতে পারে।

ইদানীং চলছে ভুয়ো এবং সাজানো খবরের রমরমা। মুনাফার স্বার্থে চ্যানেলগুলি হর-হামেশাই এই জঘন্য কাজ করে চলেছে। সমাজে এর কতটা কুপ্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এমনকী সরকারি ওয়েবসাইটেও অন্য দেশের রাস্তা-আলো-শহর ইত্যাদির ছবি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাফল্য বলে প্রচার করা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর থেকে এই হীন প্রবণতা মারাত্মক ভাবে বেড়েছে।

সম্প্রতি দু'জন বিশিষ্ট টিভি-সঞ্চালককে চ্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের হাল-হকিকৎ প্রকাশ্যে আনছিলেন। স্বভাবতই, তা সরকারি দলের মনপসন্দ হয়নি। যে-কেউ সরকারের সমালোচনা করছে তাঁকেই এভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে-সব চ্যানেল সরকার-বিরোধিতা করে জনস্বার্থের কথা তুলে ধরছে, তাদের কাজে নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। এমনকী কেবল-অপারেটরদেরও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। শাসকদলের না-পসন্দ চ্যানেলগুলো সম্প্রচার না করার জন্য অপারেটরদের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি দু'জন বিশিষ্ট টিভি-সঞ্চালককে চ্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের হাল-হকিকৎ প্রকাশ্যে আনছিলেন। স্বভাবতই, তা সরকারি দলের মনপসন্দ হয়নি। যে-কেউ সরকারের সমালোচনা করছে তাঁকেই এভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ধামাধরা পত্রপত্রিকা ঃ সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। বেশির ভাগই সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছে। কিন্তু যারা তা করছে না তাদের উপর নেমে আসছে আক্রমণ। **'ইকনমিক টাইমস'-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার দু'দিন পরেই সরকারি চাপে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করান হয়। এরকম ঘটনা সম্ভবত দেশে প্রথম ঘটল। সংবাদপত্রের মালিকেরা প্রায়শই সম্পাদকদের নির্দেশ দিচ্ছেন, সরকারের বিরুদ্ধে বেশি কিছু না লিখে বরং তার 'সাফল্যের রঙিন ছবি' তুলে ধরতে।**

পেইড-নিউজ এখন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোঝা মুশকিল, কোনটা লেখা আর কোনটা পয়সা দিয়ে লেখানো। বলা হয়, সংবাদপত্র গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তার কাজ স্বাধীন ভাবে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা। সরকার যদি জনহিতে কাজ না করে তাহলে সেগুলি প্রকাশ্যে আনা সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর মধ্য দিয়ে সঠিক জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করাই তার বিশেষ দায়িত্ব। অর্থাৎ সংবাদমাধ্যম হবে সরকারের সমালোচক, তার তল্পিবাহক নয়। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, মত প্রকাশের অধিকার এবং স্বাধীনতা কোনও অবস্থাতেই কোনও সরকার কেড়ে নিতে বা খর্ব করতে পারে না। এই অধিকারকে আরও প্রসারিত করতে 'তথ্য জানার অধিকার আইন' তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারের অপ্রকাশিত তথ্য জেনে সাংবাদিকেরা বাস্তবতা তুলে ধরেন। কিন্তু বিজেপি কার্যত এই অধিকারকে নানা ভাবে খর্ব করছে।

সরকার গণমাধ্যমকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলের 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট'কেও ব্যবহার করছে। রাফাল কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গেও এ জিনিস তারা করেছে। এর সাথে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনাটা তো বিজেপির নিত্যকার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটখাটো ব্যাপারেও সাধারণ মানুষকে তারা দেশদ্রোহিতার নামে অভিযুক্ত করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সোস্যাল মিডিয়ার উপর আক্রমণ ঃ ২০১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর সরকার একটা নতুন আইনের কথা বলে দেশের ১০টি সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছে। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টিতে কোনও কিছু আপত্তিকর মনে হলেই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী ৭ বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে। অন্য দিকে, সোস্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে দেশের সাধারণ জনগণের উপর। এবং সেজন্য তারা আইটি অ্যাক্টে এমন সংশোধন আনতে চাইছে যাতে সরকার বিরোধী প্রত্যেককে চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়। আর, নিজের ধামাধরাদের মাধ্যমে অসংখ্য ভুয়ো খবর ও ভিডিও ইত্যাদি ছড়িয়ে সমাজে ঘৃণা-বিদ্বেষকে উস্কানি দিচ্ছে। এজন্য রীতিমতো একাধিক আইটি-সেল খুলে তারা দাঙ্গা লাগাচ্ছে, গণপিটুনিতে নিরীহ গরিব মানুষকে মারছে। প্রায় সকলেই জানে, দিল্লি ও তার আশপাশে প্রায় ৪০০ জন ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করেছে বিজেপি। এদের বলা হয় স্ট্রোল ম্যানেজার। এদের কাজ হল সারাক্ষণ ভুয়ো খবর বানানো, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামূলক ভিডিও বানানো, নানা বিকৃত তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

সরকারি দলের হাতে এটা একটা নতুন হাতিয়ার। বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করার একটা মোক্ষম অস্ত্র। সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে যারা তাদেরকে সুকৌশলে বিভ্রান্ত করার কাজেই সরকার একে ব্যবহার করছে। যদিও 'আইপি অ্যাড্রেস' থেকে ভুয়ো খবর প্রচারকদের ধরা যায়, স্ট্রোল ম্যানেজারদের খুঁজে বের করা যায়। সেই আইন আছে। সম্ভবত সেই কারণেও সরকার আইটি অ্যাক্টে সংশোধন আনতে চাইছে।

বাস্তবে, তারা আইনি সংশোধন এনে প্রকৃত খবরগুলিকেই চাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করবে। না হলে, ঠিক লোকসভা ভোটের আগে এ ধরনের আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য কী? ২০১৫ সাল থেকে বিজেপি সরকার দেশে কৃষক-আত্মহত্যার তথ্য প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা প্রকাশও সরকার বন্ধ করেছে। এমনকী শ্রমমন্ত্রক থেকে কর্মসংস্থানের তথ্য দেওয়ার দপ্তরও তুলে দেওয়া হয়েছে। জিডিপি সংক্রান্ত তথ্যও সরকার বিকৃত করছে নিজের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য।

সেই ব্যর্থতা চাপা দিতেই তারা গণমাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। সে সংক্রান্ত আইন সংশোধন করতে চাইছে। গণতন্ত্র ও বাক-স্বাধীনতার পক্ষে যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের উচিত এহেন কাজের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া এবং তীব্র বিরোধিতা করা।

উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে হামলা ঃ মার্কিন ষড়যন্ত্র

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে হামলার পিছনে যে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ এফবিআই আছে, তা ফাঁস হয়ে গেল ২৬ মার্চ স্পেনের এক হাইকোর্টে বিচারকের রায়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তর কোরিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত 'ফ্রি জোস অন' গোষ্ঠীর ১০ জন ছরি, রড, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে মাদ্রিদের উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে ঢুকে পড়ে। চীনা বংশোদ্ভূত মেক্সিকান নাগরিক আদ্রিয়ান হংচ্যাং ভুয়ো পরিচয় দিয়ে দূতাবাসে ঢুকে এক রক্ষীকে কাবু করে বাকিদের ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তারপর দূতাবাসে কর্মীদের বেঁধে রেখে কয়েকটি কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক, মোবাইল ফোন, পেন ড্রাইভ নিয়ে পালায়। দূতাবাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সহ কয়েকজন কূটনীতিক গুরুতর আহত হন।

২৬ মার্চ স্পেনের উচ্চ আদালত এই মামলাটির উপর থেকে 'গোপনীয়' তকমা তুলে নিলে জানা যায় হামলার পরেই লুঠ হওয়া সামগ্রী নিয়ে হংচ্যাং সহ হামলাকারীরা পর্তুগাল হয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। তারা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আইয়ের হাতে লুঠ করা ফাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি তুলে দেয়। জানা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে এই হংচ্যাং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে চীনে জেল খেটেছে। তাকে সরাসরি মদত দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার গুপ্তচর সংস্থা। যে সংস্থা আবার এফ বি আই-এর নির্দেশেই কাজ করে। উত্তর কোরিয়ার শাস্তি পাওয়া অপরাধীরা জেল থেকে ছাড়া পেলে তাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগানই এদের গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। এই গোষ্ঠীকে অর্থ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সাহায্য দিয়ে চলেছে আমেরিকা।

স্পেনের মাদ্রিদ হাইকোর্টের বিচারক নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে, মামলাটি থেকে 'গোপন' তকমা সরিয়ে না দিলে কোনও দিন জানাই যেত না, কী জঘন্য চক্রান্ত আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনী চালিয়ে যাচ্ছে।

এই মামলা প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার পর এই গোষ্ঠীর সদস্যরা এখন বলছেন—ড্রাগ চোরাচালানের মতো কাজে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস জড়িয়ে, এই প্রচার করে মার্কিন সরকার তাদের উত্তেজিত করেছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে তাদের ভুল বুঝিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে নামানো হয়েছিল। তাদের আফশোষ এই মামলায় যাদের নাম জড়িয়েছে তারা স্পেনের আদালতে আন্তর্জাতিক অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এখনও এফ বি আই তাদের দায় নিতে রাজি নয়। তাদের প্রশ্ন, ভুল বুঝিয়ে আমাদের এভাবে বিপদের মধ্যে আমেরিকার সরকার ঠেলে দিল কেন? এই হল সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র—যা নিজের স্বার্থে মানুষের জীবনকে সর্বদাই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়।

(দ্য টেলিগ্রাফ, ইউ কে, ২৭ মার্চ ২০১৯)

কমসোমলের নদিয়া জেলা শিবির

দলের কিশোর বাহিনী কমসোমলের নদিয়া জেলা শিবির অনুষ্ঠিত হয় ২৩-২৪ মার্চ বারুইপাড়ার 'শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতি ভবনে'। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক শিশু-কিশোর শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

শিবির পরিচালনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাতশোভা বেগম, জেলা কমসোমলের ইনচার্জ কমরেড মাসুদ আলম মল্লিক। রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবির শুরু হয়।

কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষী রায় চৌধুরী শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণ দিবসের তাৎপর্য এবং এই মহান বিপ্লবীর জীবনের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। খেলাধূলা-পিটি-প্যারেড, নাচ-গান-আবৃত্তি এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শিবিরটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১৩ জনের জেলা কমসোমল প্রস্তুতি কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে শিবির শেষ হয়।

কোচবিহার জেলা ছাত্র সম্মেলন

এ আই ডি এস ও-র আহ্বানে দশম কোচবিহার জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৩-২৪ মার্চ। প্রকাশ্য সমাবেশ হয় হলদিবাড়ি বাজার বাসস্ট্যান্ডে। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি, প্রাক্তন সাংসদ ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড ডাঃ মৃদুল সরকার ও জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন বর্মন।

শহিদ ভগৎ সিং মঞ্চে প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন সম্মেলনের উদ্বোধক এস ইউ সি আই(সি) কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। প্রতিনিধি অধিবেশনে জেলার তিন শতাধিক ছাত্র আন্দোলনের নেতা, কর্মী ও ছাত্র প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান। কমরেড স্বপন বর্মনকে সভাপতি, কমরেড জহিদুল হককে সম্পাদক করে ৪১ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাওয়ালিতে পার্টি অফিস উদ্বোধন

২৩ মার্চ ভগৎ সিং স্মরণ দিবসে বাওয়ালিতে নবনির্মিত পার্টি অফিসের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। ছবিতে বক্তব্য রাখছেন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড বাসুদেব কাবড়ী। ➤

➤ *হাওড়া সদর কেন্দ্রে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন চলছে*

কার নিরাপত্তার কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী!

বিজেপি প্রচার করছে নরেন্দ্র মোদির হাতেই নাকি দেশ নিরাপদ! সত্যিই? দেশ বলতে যদি দেশের মানুষ বোঝায় তা হলে তারা কি মোদির শাসনে সত্যিই নিরাপদ?

মানুষের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হল খাদ্য নিরাপত্তা। এ দেশের প্রায় ২৬ কোটি মানুষ খালিপেটে না হলে আধপেটা খেয়ে ঘুমোতে যায়। বিজেপি-কংগ্রেসের ৭০ বছরের শাসন দেশের মানুষকে দুবেলা ভরপেট খাওয়ার নিরাপত্তাটুকুও দিতে পারেনি। খাদ্য নিরাপত্তার কথা যতটুকু আছে তা আইনের বইয়ে, বাস্তবে নেই। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি হলেও সেই খাদ্য নিয়ে দেশের একচেটিয়া খাদ্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের অবাধ মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়ায় তা আর সাধারণ মানুষের পেট ভরানোর জন্য জোটে না। কংগ্রেস সরকারের মতো বিজেপি সরকারও পুঁজিপতি শ্রেণির সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম স্বার্থটুকুকেও তাদের পায়ে বিসর্জন দিয়েছে।

জনগণের জন্য নেই স্বাস্থ্যের কোনও নিরাপত্তা। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার বেহাল অবস্থা, মুনাফা ভিত্তিক বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার রমরমা, ওষুধপত্রের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপুল খরচ বহন করতে গিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভেঙে পড়ছে বহু পরিবারে। তথ্য বলছে ভারতে ৩৫ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রতিবছর দারিদ্র সীমার নিচে চলে যাচ্ছেন।

নেই কাজের নিরাপত্তা। ভোটের পর ভোট হচ্ছে, সরকারের পর সরকার গঠন হচ্ছে, কোটি কোটি বেকারকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সংসদীয় কোনও দলের ইস্তাহারেই কাজের নিরাপত্তা তারা কীভাবে নিশ্চিত করবে তার কোনও দিশা নেই। বিজেপি রাজত্বে বেকারি অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। জনগণের প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে মালিকদের মুনাফাই উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশেই কাজের নিরাপত্তা নেই, যা দিতে পেরেছিল একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি।

দেশে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। যত দিন যাচ্ছে মহিলাদের ওপর সমস্ত রকম আক্রমণ বাড়ছে। যে দুর্বৃত্তরা-সমাজবিরোধীরা নারীধর্ষণ, অপহরণ-পাচার করে নারীজীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে, তারা এই ভোটের মরশুমে শাসকদলগুলির ছত্রছায়ায়। এরাই লক্ষ লক্ষ ভোটে লিড দেওয়ার মস্তবড় হাতিয়ার। তা ছাড়া বিজেপির যে দর্শন, তাতে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়ার কথা কোথাও নেই। বরং তাকে অন্তঃপুরে বন্দি রাখাই তাদের দর্শন।

দেশের জনগণেরই মানুষ হিসাবে মর্যাদা নিয়ে বাঁচার নিরাপত্তা যদি কোথাও না থাকে তবে দেশের নিরাপত্তা বলতে বিজেপি নেতারা কী বোঝাচ্ছেন? দেশ মানে কি দেশের মাটি? নাকি দেশ মানে দেশের জনগণ? বিজেপি নেতারা দেশ মানে মাটিই বোঝেন, মানুষ নয়!

তমলুকে পরিচারিকা সমিতির সম্মেলন

সাপ্তাহিক ছুটি, সামাজিক মর্যাদা, বাঁচার মতো বেতন, বার্ধক্য ভাতা, ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে পড়াশুনার ব্যবস্থা ইত্যাদির দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির তমলুক শহর তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ মার্চ। সভানেত্রী ছিলেন শীলা দাস। অনিতা মাইতি, অসীমা পাহাড়ী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যা ভুঁইয়াকে সভানেত্রী এবং কামিনী সাঁতরা, আলেয়া বিবিকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ১৬ জনের কমিটি গঠিত হয়।

পরিচারিকা সন্তানদের শিক্ষা-সামগ্রী প্রদান

১৭ মার্চ সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কসবা-বালিগঞ্জ শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ১৭০ জন পরিচারিকা সন্তানদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহে এলাকার শুভানুধ্যায়ীরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা বীণা জানা এবং সভাপতি তনুশ্রী শাসমল।

জেলায় জেলায় দলের প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

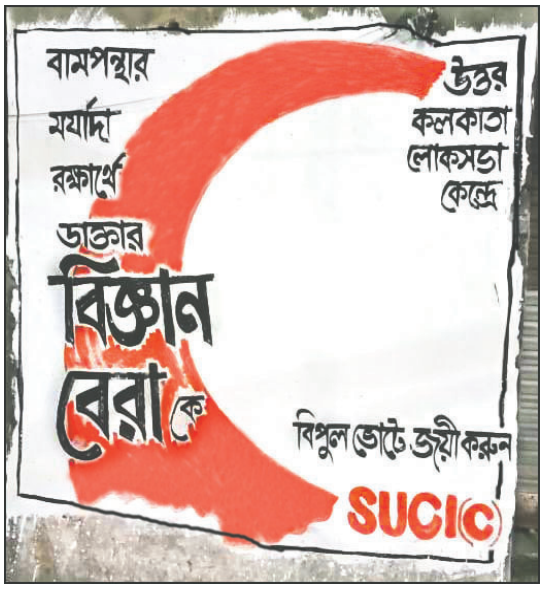

উত্তর কলকাতা

ঝাড়গ্রাম

দমদম

অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থী সংখ্যা

ওড়িশা	৮
আসাম	৬
বিহার	৮
উত্তরপ্রদেশ	৪
ছত্তিশগড়	৩
দিল্লি	২
গুজরাট	২
হরিয়ানা	৪
ঝাড়খণ্ড	৫
কর্ণাটক	৮
কেরালা	৯
তামিলনাড়ু	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	২
তেলেঙ্গানা	২
মধ্যপ্রদেশ	৩
মহারাষ্ট্র	১
পাঞ্জাব	১
রাজস্থান	১
ত্রিপুরা	১
উত্তরাখণ্ড	১
পুদুচেরি	১

বিধানসভায় প্রার্থী

ওড়িশা	২৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩

রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	বীরেন মহন্ত
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	শানওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যোৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালিক
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

মহারাষ্ট্রে রামটেক কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি)

মহারাষ্ট্রে নাগপুর জেলার রামটেক কেন্দ্রে নির্বাচন ১১ এপ্রিল। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা করে একদল যুবক বুকভরা বিপ্লবী উত্তাপ নিয়ে যাচ্ছেন মানুষের ঘরে ঘরে। ভোট চাইছেন দলীয় প্রার্থী কমরেড শৈলেশ জনবন্ধুর সমর্থনে। প্রার্থী কী বলছেন ভোটারদের? বলছেন, "আমরা সারা বছর রাস্তায় থেকে আন্দোলন করি। আপনাদের সমর্থন নিয়ে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে চাই।" জনগণ এ ধরনের প্রচার শুনে বিস্মিত। 'এ ভাবে তো কাউকে প্রচার করতে দেখি না, ভোট চায়— টাকাও চায়, সত্যিই একটা নতুন ধরনের পার্টি এবার ভোটে নেমেছে' মন্তব্য এখানে সেখানে। এ রাজ্যে অন্য দলগুলির শাসন মানুষ দেখেছেন। কংগ্রেস বিজেপি বা শিবসেনা— কারওর শাসনেই জনজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে কিছু পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নয়, গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে ভোট চাওয়া নতুনত্ব বইকি। পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যে একটা নতুন প্রত্যাশা অন্তত জাগাতে পেরেছে এস ইউ সি আই (সি)। প্রত্যাশা পথ চেনাবে। সংগ্রামী বামপন্থার পথ, যে পথেই হবে শোষণমুক্তি।

জেলায় জেলায় দলের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল-পদযাত্রা

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড রবিচন রাভা এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড প্রভাত রায়ের সমর্থনে পদযাত্রা হল তুফানগঞ্জ পৌরসভা এলাকায়

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বীরেন মহন্তর সমর্থনে প্রচার

পাঠকের মতামত

গবেষণাতেও বিজেপি সরকারের ফতোয়া

গবেষণার বিষয়বস্তু হতে হবে জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এমন সব বিষয়েই। তবেই পিএইচডি করার অনুমতি দেওয়া হবে। এটিই বর্তমানে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ফরমান। ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর ১১টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি সভায়, যেখানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব আর সুব্রহ্মনিয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি পি সিং, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করা হবে তা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৩ মার্চ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ কেরালার রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের চিঠি দিয়ে জানান জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের তালিকা তৈরি করতে হবে যার বাইরে কোনও বিষয় নিয়ে গবেষণা করা চলবে না। তবে জাতীয় স্বার্থ কী তা স্পষ্ট করা হয়নি ওই নির্দেশিকায়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে গুজরাট সরকার অনুরূপ নির্দেশ জারি করে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত ৮২টি বিষয়ের একটি তালিকা দেয় যেগুলির মধ্য থেকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা করতে হবে। স্পষ্টতই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির অন্যতম এজেন্ডা হিসাবেই গবেষণার ওপর এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

মনে রাখা দরকার যথার্থ শিক্ষা ও গবেষণা কোনও জাতীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার এক ও একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞানের প্রসার। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অর্থ জ্ঞানের বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত করা। গবেষণার জন্য প্রয়োজন মুক্ত পরিবেশ যেখানে চিন্তার, প্রশ্ন করার এবং বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে। তাই যারা গবেষণাকে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মুক্ত জ্ঞান চর্চার পথ রুদ্ধ করতে চায় তাদের দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

প্রশ্ন হল, জাতীয় স্বার্থ বলতে কী বোঝায়, কী অর্থে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ কী তা স্থির করবে কে? কীসের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ স্থির করা হবে? তা কি পুঁজিবাদী বাজারের চাহিদা অথবা ক্ষমতাসীন দলের বিচার অনুযায়ী নির্ধারিত হবে? অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে এটা কি চলতে পারে? এ ধরনের ফতোয়ার অর্থ মৌলিক ও তাত্ত্বিক গবেষণা যা সরাসরি প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, সেই সব গবেষণার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। যাঁরা জ্ঞানের প্রসার চান, যা গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য, তাঁরা কি এটা মেনে নিতে পারেন?

এই ফতোয়ার পরিণাম ভয়ঙ্কর। এটি মুক্ত জ্ঞানচর্চার পথে বাধাস্বরূপ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও গবেষকদের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করবে। সরকারের দায়িত্ব হল অর্থের অভাবে যাতে গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা, কিন্তু কোনও অজুহাতেই গবেষণার উপর খবরদারি করা নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নানা ভাবে মুক্ত চিন্তার পথ, বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্র রুদ্ধ করতে সচেষ্ট।

আশার কথা শিক্ষক-গবেষকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সরকারের এই নির্দেশকে আত্মঘাতী ও সামন্তী বলে আখ্যায়িত করে তার প্রতিবাদে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ ইংলিশ-এর অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজ-এর ডঃ মিনা টি পিল্লাই ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের বোর্ড অফ স্টাডিজ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর মতে কর্পোরেটদের স্বার্থেই এই সার্কুলার। এতে মুক্ত চিন্তা ধ্বংস হবে যা শিক্ষার ক্ষতি করবে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়তী ঘোষ এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, এই সরকারের নীতিই হল বিরোধী সমালোচনা চলবে না। প্রতিবাদের মুখে ২৫ মার্চ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রক বলেছে, তারা এই সার্কুলার দেয়নি। কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই, কারণ তাদের নীতিই স্বাধিকারের হস্তক্ষেপ। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি অবিলম্বে এই সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

ড. প্রদীপ কুমার দত্ত,
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলকাতা

আর্সেনিক আক্রান্তদের আন্দোলনের জয়

আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে বহু বছর ধরে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের ধারায় ১২ মার্চ গাইঘাটা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং পরিবার প্রতি মাসে ১২ কেজি চাল, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, উপযুক্ত চিকিৎসা ইত্যাদি দাবিতে স্মারকপত্র দেওয়া হয়। বিডিও প্রথমোক্ত দুটো দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

সেই মতো ১৩ মার্চ আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যান মেডিকেল টিম সহ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই পরিদর্শনের সময় আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় অবিলম্বে এখানে স্পেশাল মেডিকেল ক্যাম্প বসিয়ে আর্সেনিক আক্রান্তদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার জন্য। শেষপর্যন্ত ১৯ মার্চ গাইঘাটার বিষ্ণুপুরে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের ওষুধপত্র এবং সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। ২০ মার্চ বিডিও অফিস থেকে আর্সেনিক রোগীদের চালের কুপন দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হল। কমিটির সম্পাদক অশোক দাস বলেন, এটা লাগাতার আন্দোলনের জয়। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের সমস্ত আর্সেনিক আক্রান্তদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের সুচিকিৎসা এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে অবিলম্বে আর্সেনিক রোগীদের চাল, ডাল সহ পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আর্সেনিক বিষ ক্রিয়ায় মৃত পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য করতে হবে। এই দাবিতে তিনি, আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান।

ট্রাম্পকে ধিক্কার দিচ্ছেন ইয়েমেনের মানুষ

উত্তর ইয়েমেনের হোডেইভা শহরে তো বটেই, যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই ছোট্ট দেশটির জায়গায় জায়গায় ফুটে উঠেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যাঙ্গচিত্র। ছবিটি এই রকম— জার্সি গাইয়ের রূপ নিয়েছেন সৌদি আরবের রাজা। পাশে টুলে বসে তার দুধ দুইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুধ জমা হচ্ছে কতকগুলি সোনালি পাত্রে। তার গায়ে আঁকা ডলারের ছবি। কোথাও আবার এইরকম—একটি প্লেন বোমা ফেলছে, তার মুখের দিকটা ট্রাম্পের মতো, বোমাগুলো সৌদি রাজা। এমন নানা চিত্র ফুটে উঠেছে ইয়েমেনের দেওয়ালে। বোঝা যায় চার বছর ধরে সৌদি আরবের বকলমে ইয়েমেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। ইয়েমেনের মানুষ মার্কিন চক্রান্তটা ধরে ফেলেছেন।

মার্কিন শাসকদের অপছন্দের হুথি আন্দোলন ১৯৯০-এর পর থেকে ইয়েমেনে জোরদার হয়েছে। এই হুথি আন্দোলন দমন করে নিজেদের পছন্দের শাসককে গদিতে টিকিয়ে রাখা এবং ইয়েমেনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের ব্যবস্থা করতে মার্কিন-সৌদি জোট যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের উপর। এই যুদ্ধে সমৃদ্ধশালী আরব দেশগুলিকে দুইয়ে নিয়ে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে বিমান হানায়, ক্ষেপণাস্ত্র সহ নানা অস্ত্রের আঘাতে। স্কুল বাসের উপর বোমা ফেলতে, ইয়েমেনের প্রায় সব হাসপাতাল বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতেও মার্কিন-সৌদি জোটের আটকায়নি।

এর মধ্যেই প্রায় রোজই যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে সামিল হচ্ছেন হাজার হাজার ইয়েমেনবাসী। তাঁর চিৎকার করে বলছেন— 'শয়তান, আর কত রক্ত পেলে তোদের এই যুদ্ধ বন্ধ হবে?' শিক্ষকরাও মিছিলে। তাঁরা বলছেন, সামনে সৌদি থাকলেও আমরা জানি আমাদের সন্তানদের আসল খুনি কে? ইয়েমেনের মানুষের এই হার না মানা মনোভাবই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। বোমা-বন্দুক অস্ত্র যে শেষ কথা বলে না, আবার প্রমাণ করতে চান ইয়েমেনের মানুষ।

শাস্তি দিতে পারলেন না বিচারপতি

একের পাতার পর

এই সব সুটকেসের কভারগুলি সেলাই করেছিল ইন্দোরের যে দর্জি, যে কারখানায় সেগুলি বানানো হয়েছিল, পুলিশ তার সন্ধান পেয়েছিল। বিচারক আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, ওই সুটকেস এবং তার কভারগুলির ক্রেতাদের শনাক্ত করার জন্য ওই দর্জি এবং সুটকেস বিক্রেতাকে কেন এনআইএ এবং সরকারি আইনজীবী 'টিআই প্যারেডে' ডাকেনি, তা একমাত্র তারাই বলতে পারবে!

আদালত আরও বলেছে, এই অভিযুক্তরা যে ঘটনার আগের দিন ইন্দোর থেকে নিজামুদ্দিন স্টেশনে এসেছিল, তারা ঘটনাস্থল ভাল করে রেকি করার জন্য বেশ কয়েকবার পুরনো দিল্লি রেলস্টেশনের ডরমিটরিতে থেকেছে, তার তথ্য আছে বলে এনআইএ এবং সরকারি আইনজীবী মুখে উল্লেখ করলেও সরকারি ভাবে আদালতে কিছু প্রমাণ পেশ করেনি। যেমন পেশ করেনি অভিযুক্তদের ফোনের 'ডিটেল কল রেকর্ডস'। ঘটনার আগে এবং পরে এরা নিজেদের মধ্যে কতবার ফোন করেছে, কাকে কাকে ফোন করেছে তার বিস্তারিত তথ্য এনআইএ এবং সরকারি আইনজীবীর কাছে আছে বলে উল্লেখ করা হলেও সরকারিভাবে 'অন রেকর্ড' আদালতে জমা দেয়নি সরকারপক্ষ। এমনকী অভিযুক্তরা বোমা রাখার পর কীভাবে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল তা মুখে বললেও এনআইএ সেগুলি আদালতে নথিভুক্ত করেনি। আন্তর্জাতিক ট্রেনে ওঠার আগে যাত্রীদের কিছু ফর্মে স্বাক্ষর করতে হয়, তা না হলে ওই প্ল্যাটফর্মেই কেউ ঢুকতে পারে না। আদালত আক্ষেপ করে বলেছে হস্তরেখা বিশারদের সাহায্যে এগুলি অভিযুক্তদের হাতের লেখার সাথে মেলালে সহজেই তাদের ধরা যেত। কিন্তু না সরকারি উকিল, না এনআইএ কেউই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে বিচারককে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কিছুই প্রমাণিত না হওয়াটা একজন বিচারক হিসাবে তাঁর কাছে বেদনাদায়ক।

এর আগে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের মামলাতেও বিচারক রায় দিতে গিয়ে এমনই আক্ষেপ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এনআইএ-র বিশেষ আদালতের বিচারক এই মামলার পরেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল অসীমানন্দের সঙ্গে একই জেলে থাকা এক বন্দির বয়ান। যে আদালতকে জানিয়েছিল অসীমানন্দ তার কাছে অপরাধের কথা কবুল করেছে। কিন্তু সে আর অসীমানন্দ যে একই সময় একই জেলে ছিল, তা এনআইএ আদালতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেনি। তার জন্য দরকার ছিল জেল রেজিস্টারটি আদালতে হাজির করা, অথচ এই সামান্য এবং সহজলভ্য প্রমাণটিও এনআইএ আদালতে দাখিল করেনি।

২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বে রাজ্য সরকার এবং বিজেপি ও সংঘ পরিবারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। তার কোনও তদন্তই গুজরাট সরকার করতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, যে পুলিশ অফিসার এই নিধনযজ্ঞের প্রধান চক্রান্তকে ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেল খাটিয়েছে বিজেপি সরকার। দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হলেও এই হত্যাকাণ্ডের মূল রূপকার বলে সারা দেশ যাদের জানে, যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রমাণ আছে, যারা নিজেরাই এই হত্যার জন্য নিজেদের গর্বিত বলেছে, সংঘ পরিবার-বিজেপির সেই সব নেতার গায়ে আঁচড়টুকুও পড়েনি। ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার মামলায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাক্ষী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের বহুজনেরই রহস্য মৃত্যু ঘটেছে। এমনকী একজন বিচারক, যিনি অমিত শাহকে ভুয়ো সংঘর্ষ মামলা থেকে ছাড় দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু নিয়েও আছে রহস্য।

সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ মামলা নিয়ে আজ বিজেপি নোংরা খেলা খেলল, একথা ঠিক। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ করে দিয়ে গেছে তো কংগ্রেস সরকারই। তারাই এই সন্ত্রাসবাদীদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী পরিচয়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠিকমতো সাজায়নি প্রথম থেকেই। কারণ একদিকে তাদের চেষ্টা ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসী রূপকে দেখিয়ে সংখ্যালঘু মানুষের ত্রাতা সাজা, আবার অন্যদিকে হিন্দু সেন্টিমেন্ট তুলে এর ফয়দা নেওয়া। বিজেপি তার থেকেও বেশি উগ্রতা দেখিয়ে কংগ্রেসের পালের সেই হাওয়া কেড়ে নেওয়ায় কংগ্রেস এখন মহা সাধু সাজছে! বাস্তবে কংগ্রেসই বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জমি তৈরি করে দিয়ে গেছে। যার ফলভোগ করছে সারা দেশের সাধারণ মানুষ।

নির্বাচনটা নীতিভিত্তিক না হলে কু-কথার স্রোত এবং মানি-মাফিয়ার ব্যবহার বাড়বেই

ভারতে নির্বাচনগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, নির্বাচনে ভালমন্দ বিচারটাই যেন ক্রমাগত হারিয়ে যচ্ছে। দল বা দলীয় প্রার্থীর নীতি-আদর্শ কী, সে আদর্শ সমাজ বা দেশের অগ্রগতির সহায়ক কি না, দেশের মৌলিক সমস্যা বিশেষভাবে বেকার সমস্যা, শিল্পায়নের সমস্যা, কৃষির সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত কি না ইত্যাদি কোনও বিষয়ই বিচারের মধ্যে মূলত আনা হচ্ছে না। না মিডিয়া প্রচারে, না দলীয় প্রচারে কোথাওই এর লেশমাত্র নেই। নির্বাচন দাঁড়িয়ে গেছে 'কে জিতবে, কে হারবে' এই গণ্ডিতে। জনস্বার্থে কার জেতা উচিত, কার হারা উচিত এবং এই কারণে উচিত ইত্যাদি বিষয় প্রচারে নেই।

প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখছে সেখানে বইছে কু-কথার স্রোত। সোস্যাল মিডিয়াতেও ছড়ানো হচ্ছে কুরুচিকর, অশালীন বক্তব্যের বিষ। তাতে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সহনশীলতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিদ্বেষ মাথা তুলছে। এই কু-কথার স্রোত এত লাগামছাড়া যে, তা নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশন বলছে তারা অসহায়। শুধু কি পশ্চিমবঙ্গে? প্রতিটি রাজ্যেই এ জিনিস চলছে এবং সংসদীয় সব রাজনৈতিক দলের তাবড় তাবড় নেতারা পর্যন্ত এর বাইরে নন।

একে অপরের বিরুদ্ধে এরা চিন্তা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে পারছেন না কেন? বিচার করলে দেখা যাবে, তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে শব্দ এবং বাক্যগত পার্থক্য যাই থাকুক, প্রত্যেকের রাজনীতি এক সুরে বাধা। সেটা কী? সেটা হচ্ছে যেভাবেই হোক ভোটে জেতা এবং সরকার গঠন করে ভারতের শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করা, পার্লামেন্টে বা বিধানসভায় তাদেরই স্বার্থে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া। এদের বিগত বছরগুলির ইতিহাস বা কার্যধারা বিচার করলে এই বক্তব্যের সত্যতা অবশ্যই মিলবে। তা হলে প্রতিটি দলই যদি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়, তা হলে তারা কী করে একে অপরের বিরুদ্ধে নীতিগত এবং পরিশীলিত রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবে? কী করেই বা সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াবে? এটা সম্ভব নয়। আবার সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বা বিভ্রান্ত করে— পক্ষে আনতে না পারলে ভোটে জেতা মুশকিল। সেই কারণে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ, কুৎসা— এ সবেই মত্ত।

আরেকটা জিনিস প্রবলভাবে চলছে। সেটা হচ্ছে টাকার থলি ও গুন্ডারাজের ব্যবহার। প্রার্থী হতে বাধা দেওয়া, প্রচার করতে বাধা দেওয়া, বুথ দখল করে ছাপ্পা মারা, গণনা কেন্দ্রে পর্যন্ত ছাপ্পা দিয়ে বিরোধী ভোট বাতিল করা সবই এ রাজ্যের মানুষ বিগত নির্বাচনগুলিতে দেখেছে। অন্য রাজ্যেও ঘটছে। বিষয়টা এত ব্যাপক যে, ভারতের ১৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'গুন্ডারাজ এবং টাকার থলির অশুভ জোট ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে'। (হিন্দুস্থান টাইমস— ২৬.১২.২০১৭)।

নবীন চাওলা সাড়ে পাঁচ বছর ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়েছে। তাঁর কার্যকালে রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনও। সে সব দেখে তাঁর উপলব্ধি 'মানি পাওয়ার' এবং 'মাসল পাওয়ার' হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচনে জেতার মূল নিয়ামক। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় গণতন্ত্রে গুন্ডারাজের প্রাদুর্ভাব কোনও নতুন বিষয় নয়, '৭০-'৮০-র দশক থেকেই এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে।

চাওলা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, এখন কোটিপতি এবং ক্রিমিনালরাই নির্বাচনে জয়ী হয়। দেখিয়েছেন ১৫তম বা ১৬তম লোকসভায় প্রায় ৩০ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধেই এক বা একাধিক ক্রিমিনাল কেস বা ফৌজদারি মামলা রয়েছে। খুন, খুনের উদ্দেশে আক্রমণ, তোলাবাজি, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি— এই ধরনের মামলাই তাদের বিরুদ্ধে বেশি। বোঝা যায় জনস্বার্থে আন্দোলন করার জন্য পুলিশ এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেনি, মামলা সত্যিই অপরাধজনিত।

রাজনৈতিক দলগুলি এদের প্রার্থী করে কেন? এদেরই বা কেন সাংসদ হওয়া জরুরি প্রয়োজন? সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এদের প্রার্থী করে এদের মস্তান বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সহজে ভোটে জেতার জন্য। '৮০-র দশক পর্যন্ত এই সব মাফিয়ারা বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলকে বা তার প্রার্থীকে সাহায্য করত যাতে প্রার্থী বিজয়ী হয়ে ক্রিমিনালদের স্বার্থ রক্ষা করে— পুলিশি গ্রেপ্তার থেকে বাঁচায় বা নিদেন পক্ষে তাদের কাজে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এখন তারা নিজেরাই নির্বাচনে দাঁড়ায়, যাতে বিধায়ক সাংসদ হয়ে নিজেরাই সব কন্ট্রোল করতে পারে।

২০১৪ সালে যে লোকসভা নির্বাচন হল এবং বিজেপি সরকার গঠন করল, সেই লোকসভায় ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৪৪২ জন। দেশের অতি নগণ্য অংশ কোটিপতি। ৯৫ ভাগ মানুষই তো গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত। সংসদে তাদের প্রতিনিধি কোথায়? বাস্তবে পার্লামেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনীদের প্রতিষ্ঠান। এই কোটিপতি সাংসদরা কী সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে? তথ্য বলছে, সংসদে যতগুলি জনবিরোধী বিল পাশ হয়েছে তাতে সম্মতি দিয়েছে এই সাংসদরা।

জনসাধারণ কোটিপতি এবং ক্রিমিনাল প্রার্থীদের বারবার ভোট দিচ্ছেন কেন? তাদের হয়ে কাজ করবে এমন প্রার্থীদের কেন তারা ভোট দিচ্ছেন না বা নির্বাচিত করছেন না? এখানেই রয়েছে মিডিয়ার ভূমিকা। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে প্রিন্ট মিডিয়া এখন পুরোপুরি পুঁজিপতি শ্রেণির কব্জায়। পুঁজিপতি শ্রেণি যে প্রার্থীদের মনে করে তার বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে কাজ করতে পারে, সেই সেই প্রার্থীর বা প্রার্থীর দলের হয়ে এমন জোরালো প্রচার শুরু করে যে, সাধারণ মানুষের চোখ ঝলসে যায়। প্রচারের তোড়ে মানুষ ভাবতে শুরু করে এই প্রার্থীরই জেতার সম্ভাবনা। ফলে তাকেই ভোট দিয়ে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণি সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবামাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে হাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়।"

নির্বাচনে এক একটি কেন্দ্রে যত প্রার্থী থাকে বুর্জোয়া মিডিয়া তার মধ্যে থেকে দু'তিন জন প্রার্থীকে প্রচার দেয়। বাকিদের কথা উল্লেখ করে না বললেই চলে। এটা একটা বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষ এই ফাঁদে পড়ে বুর্জোয়া প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুর্জোয়াদের প্রার্থীকে নিজের পছন্দের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করে বসেন। ফলে বুর্জোয়াদের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কাজ করে। জনগণের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে নানা বিল পাশ করায়। তার বিনিময়ে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্তিও ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে এই জিনিসই ঘটছে। যা দেখে সাধারণ মানুষ বলেন, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। এরা যে লঙ্কায় যাওয়ার আগেই রাবণ জনসাধারণ তা ধরতে পারেন না প্রচারের জৌলুসে। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ শ্রেণি সচেতন না হচ্ছে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির সত্যিকারের দল এবং প্রার্থীকে চিনতে না পারছে, তার পক্ষে বলিষ্ঠভাবে না দাঁড়াচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চিকিৎসাহীন সুপার স্পেশালিটি!

ভোটের প্রচারে তৃণমূল সরকার বলছে, রাজ্যে তারা চিকিৎসার ব্যবস্থার বিরাট উন্নয়ন করেছে। কী উন্নয়ন? তাদের বক্তব্য, তৃণমূল সরকার রাজ্যে ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করেছে, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা বিমার ব্যবস্থা করেছে। হাসপাতালে তারা নাকি বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নায্য মূল্যের ওষুধের দোকানকেও তারা বিরাট সাফল্য হিসাবে দাবি করছে।

এই দাবির সাথে বাস্তবের মিল কতটুকু? সুপার স্পেশলিটি হাসপাতালগুলির কথাই ধরা যাক। এখানে কেমন চিকিৎসা মেলে? গত ২০ এবং ২১ মার্চ এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক যে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে তার শিরোনাম "ইমারজেন্সি রোগী এলে পত্রপাঠ বিদায়!" কেন বিদায়? কারণ নামটি সুপার স্পেশালিটি হলেও চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। চোখ ধাঁধানো ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং থাকলেই তো চিকিৎসা হয় না। দরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। সেই কাজটা সরকার করেছে কি?

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলতে কী বোঝায়? বোঝায় এমন হাসপাতাল যেখানে কার্ডিওলজি, কার্ডিওভাসকুলার সার্জারি, নিউরোলজি, নিউরো সার্জারি, প্লাসটিক সার্জারি, এন্ডোক্রিনোলজি, নেফ্রলজি, ইউরোলজি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইত্যাদি বিভাগ থাকবে এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসার সরঞ্জাম পরিক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, অপারেশনের ব্যবস্থা অন্তর্বিভাগ-বহির্বিভাগ এবং নার্সিং স্টাফ, টেকনিশিয়ান, জেনারেল ডিউটি স্টাফ সহ পর্যাপ্ত লোক বল। এগুলির ব্যবস্থা না করে কেবল সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেই কোনও হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি স্তরে পৌঁছে যায় না।

সরকারের উদ্দেশ্য যদি সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ সহজে পৌঁছে দেওয়া হত, তা হলে তারা রাজ্যের ১৩টি মেডিকেল কলেজকেই বেছে নিতে পারত, সেগুলিকে সুপার স্পেশালিটির স্তরে উন্নিত করাই ছিল সহজ উপায়। আর জেলায় জেলায় দরকার ছিল পূর্ণাঙ্গ সাধারণ হাসপাতাল। কারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার লাগে এই ধরনের হাসপাতালেরই। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দরকার বিশেষ কিছু বিরল রোগের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলবার তোড়ে মাল্টি স্পেশালিটির সাথে সুপার স্পেশালিটিকে গুলিয়ে ফেলছেন। কলকাতার এস এস কে এম-এর মতো হাসপাতাল বর্তমানে আংশিকভাবে সুপার স্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু রয়েছে। তাও ধুঁকছে লোকবল এবং পরিকাঠামোর অভাবে। সেখানে ভর্তি হতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তারিখ পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। অন্য মেডিকেল কলেজগুলির ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার জরুরি পরিষেবা কোথাও নেই। নিউরোসার্জারির অপারেশনের ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই বললেই চলে। হার্টের অপারেশন এস এস কে এম, এন আর এস, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, আর জি কর মেডিকেল কলেজে কিছু কিছু হলেও অন্যান্য মেডিকেল কলেজে এই বিভাগগুলির অস্তিত্ব প্রায় নেই।

মনে রাখা দরকার স্বাধীনতার পর ভারতে যত স্বাস্থ্য কমিশন বসেছে তারা কেউই ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাইরে যাওয়ার কথা বলেনি। তাদের বক্তব্য প্রথমে থাকবে প্রিভেন্টিভ কেয়ার অর্থাৎ রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তারপর থাকবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। সেখান থেকে প্রয়োজন হলে রেফার করতে হবে সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টারে অর্থাৎ মহকুমা জেলা হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজগুলিতে। তা হলে স্বাস্থ্য কমিশনগুলির এই পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হল না কেন? দ্বিতীয়ত, জনগণের চিকিৎসাই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে তৈরি হওয়া সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ৮০ শতাংশেরও বেশি চিকিৎসক পদ পূরণ করা হয়নি কেন? যে ২০ শতাংশেরও কম চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে, তথ্য বলছে তারা কেউই সুপারস্পেশালিটি ডাক্তার নন। তাদের পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে, যার ফলে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাও বিঘ্নিত হচ্ছে।

আবার এঁরা সুপারস্পেশালিটি ডাক্তার না হওয়ার কারণে সুপারস্পেশালিটি পরিষেবা দিতে পারছেন না। দুদিক থেকেই সমস্যার। এই ৪১টির মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে, ৩৬টিতে অন্তর্বিভাগ নেই। ফলে ইমারজেন্সি রোগী এলে পত্রপাঠ রেফার করা করা ছাড়া ডাক্তারদের কি কিছু করণীয় আছে?

ডাক্তার ছাড়া হাসপাতাল চলবে না— রাজ্য সরকারের কর্তারা তা বোঝেন না এমন নয়। তা হলে সরকার এই নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে দিল কেন? এর উদ্দেশ্য হল, 'সরকারি জমিতে সরকারি টাকায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করে তারপর চালাতে পারছি না' এই অজুহাতে হাসপাতালগুলিকে বেসররকারি মালিকদের হতে তুলে দেওয়া। আর এই হাসপাতালগুলিতে রোগী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিকল্পিত ভাবে সরকারি চালু হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়ায় পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সরকার চালাতে না পারলে বেসরকারি হাতে দিক। সরকার দিতেও শুরু করেছে। ইতিমধ্যে শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জিন্দাল গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প বিমা নির্ভর। রোগীকে এইজন্য প্রিমিয়াম দিতে হয়। সব চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর সুবিধা মিলবে না। মিলবে শুধু ভর্তি হলে। এ ক্ষেত্রেও সরকারের উদ্দেশ্য বিমা কোম্পানিগুলির সুবিধা

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

চা-শ্রমিকদের সমস্যার কথা মুখেই আনলেন না বিজেপি সভাপতি

চা-বাগান অধ্যুষিত লোকসভা কেন্দ্র ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার। ২৯ মার্চ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করলেন। কিন্তু চা-বাগিচা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। এই চা শিল্পের মালিকরা মাঝে মাঝেই নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামতো লকআউট ঘোষণা করে। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসে। অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে থাকতে অপুষ্টিতে ধুঁকে ধুঁকে কত শ্রমিক মারা যায়। কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই মালিকদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। শ্রমিক পরিবারগুলির অভাবের সুযোগ নিয়ে বাইরে কাজ দেওয়ার নাম করে কত মেয়ে পাচার-বিক্রি হয়ে যায়।

এখানকার অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র চা-বাগান। শিল্প বলতে এটাই। কিন্তু শিল্পের যারা আসল চালক সেই শ্রমিকদের নেই কোনও নিরাপত্তা। নেই ন্যায্য মজুরি। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই-এর টাকাও মেরে দিয়ে মুনাফা বাড়াচ্ছে মালিকরা। সরকার এদেরই চৌকিদার। 'শোষণের শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিকদের হারানোর কিছু নেই' জানলেই তো শুধু মুক্তি মেলে না। চাই সচেতনতা এবং সংগঠনশক্তি। সিপিএম-আরএসপি দীর্ঘকাল এদের ভোট নিয়ে এমএলএ, এমপি হয়েছে, শোষণ মুক্তির দিশা দেখায়নি। আদর্শগত চেতনার এই ঘাটতির পথ ধরেই নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখানে মাথা তুলছে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে এঁদের ভোট লুঠ করে এমপি-মন্ত্রী হওয়ার। এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড রবিচন রাভা ভোটের প্রচারে নেমেছেন। তাঁর প্রতীক টর্চ লাইট। চা-শ্রমিকদের দাবিগুলি সহ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা নানা অংশের দাবিগুলি তিনি যেমন পার্লামেন্টে তুলে ধরবেন, তেমনই পথে নেমে গণআন্দোলনও গড়ে তুলবেন— জনগণের কাছে এই তাঁর শপথ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষকদের দাবিপত্র পেশ

১৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে সামিল হয়েছেন বিক্ষোভ মিছিলে

পড়ুন ও পড়ান

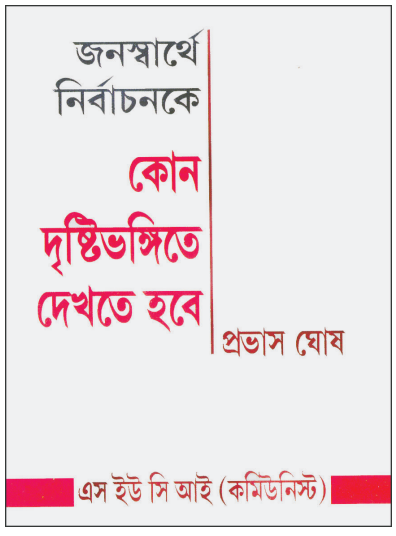

সুপার স্পেশালিটি

সাতের পাতার পর

করে দেওয়া। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের যে কথা সরকার বলছে, সেখানেও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। প্রথমত, সব ধরনের ওষুধ সব দোকানে মেলে না। দ্বিতীয়ত, যে ওষুধগুলি পাওয়া যায়, কিছুটা কমিশন মিললেও তার গুণমান নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে। সর্বোপরি হাসপাতালে একসময় বিনামূল্যে ওষুধ মিলত, সেখানে এখন ন্যায্য মূল্যের নামে দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে সব ওষুধ। এ সবের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে হরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার।

লাভবান পুঁজিপতিরা, খুশি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্পোরেট মালিকরা। সরকারের এই দুরভিসন্ধির পর্দা ফাঁস করে দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে লড়ছে এসইউসিআই(সি)।

রাজ্য সরকারের ধ্বংসাত্মক আবগারি নীতি

মদ বিক্রি করে দশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩১ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"মদ বিক্রি করে দশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তরে যখন খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে তখন ওই দপ্তরের মন্ত্রী কি জানেন এর জন্য কত পরিবার উচ্ছন্নে গেছে, কত পড়ুয়া কে স্কুল ছাড়তে হয়েছে, অনাহার মৃত্যুতে কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত নারীর ইজ্জত নষ্ট হয়েছে? তাঁরা কেবল রাজস্বের পরিমাণটা দেখলেন? বিনিময় মূল্যটা দেখলেন না? সিপিএম পরিচালিত বিগত সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছিল, তৃণমূল তাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই ধ্বংসাত্মক আবগারি নীতির আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। এস ইউ সি আই (সি) দল রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনের চাপে ভোটের মুখে সরকার সাময়িকভাবে নতুন অনুমোদিত ১২০০ মদের দোকান খোলা স্থগিত করেছে। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরার দাবিতে আগামী দিনে দলের তরফ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে এই নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হবে"।

মদবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার

১৮ মার্চ মন্দিরবাজার থানার ঢোলা-রামগঙ্গা রুটের সুলতানপুর মোড়ে মদের দোকান বন্ধ ও গাববেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে মদ মুক্ত করার দাবিতে পথ অবরোধ করে গাববেড়িয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ।

সুলতানপুরের মদের দোকান ও নতুন করে আরও একটি মদের দোকানের অনুমোদন দেওয়ায় গাববেড়িয়া এলাকায় গড়ে ওঠে মদ বিরোধী এই মঞ্চ। ১৭ মার্চ সুলতানপুরের মদের দোকান থেকে মদ নিয়ে রাস্তায় ওঠার সাথে সাথে বাসের ধাক্কায় স্থানীয় এক যুবকের মৃত্যুতে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং পরের দিন রাস্তা অবরোধ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েক হাজার নারী-পুরুষ তাতে সামিল হন। খবর পেয়ে, মন্দিরবাজার, কুলপি ও ঢোলা থানার পুলিশ উপস্থিত হয়। পরে ঘটনাস্থলে সি আই, মন্দির বাজারের ডিএসপি, সুন্দরবনের ডিএসপি বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেন। পুলিশের আক্রমণে ৩০-৩৫ জন নারী-পুরুষ জখম হন। আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ প্রামাণিক সহ ৭ জনকে (২ জন মহিলা সহ) গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। তাঁদের বেশ কয়েক দিন জেলে আটকে রাখা হয়। ১৯ মার্চ এলাকার নাগরিক গোপাল হালদার নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের এই ভূমিকায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। গাববেড়িয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করা হয়েছে এবং প্রস্তুতি চলছে আন্দোলনকে বৃহত্তর আকার দেওয়ার।

মুখ্যমন্ত্রী পাশ-ফেল চালুর প্রতিশ্রুতি রাখেননি

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সময় আজকের মুখ্যমন্ত্রী, তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী প্রাইমারি স্তরে পাশ-ফেল চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা রাখেননি। এস ইউ সি আই (সি)'র দীর্ঘ আন্দোলন, ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই ডাকা বাংলা বনধ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাশফেল চালুর পক্ষে মত দেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে পাশফেল চালুর পক্ষে আইনও তৈরি হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ বিশেষত এ রাজ্যের মানুষ প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল চাইলেও অন্তত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে। তবু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী পাশ-ফেল চালু করেননি। বাস্তবে তৃণমূল সরকারের এই টালবাহানা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা জীবনের সর্বনাশ করেই চলেছে। অন্য দিকে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী কি মনে করেন, এইভাবে টালবাহানা করে ভোট উতরে দিতে পারলেই মানুষ সব ভুলে যাবে? কিন্তু তা হওয়ার নয়। এই নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রেই এস ইউ সি আই (সি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পাশ-ফেল চালুকে অন্যতম দাবি হিসাবে রেখে। নির্বাচন শেষ হলে আরও অনেক বেশি শক্তি নিয়ে পাশ-ফেল চালুর আন্দোলন গড়ে উঠবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com